DEPARTMENT OF MUSIC

CC:5 T **Prof. Pritam Katham.**

Unit 5: study of the following text s with reference to musical aspects:

1. Natya Shastra, 2. Brihaddeshi, 3. Sangeet Ratnakar, 4. Naradiya Shiksha,

5. Chaturdandi Prakashika.

1. ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আলোচিত সংগীত সম্পর্কে আলোচনা :

ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন, কারণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষের চেয়ে প্রাচীনতর সভ্যদেশ পৃথিবীতে অল্পই আছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর যে কোনো সু-প্রাচীন সভ্যদেশের অভিজাত সংগীতের চেয়ে ভারতবর্ষের বৈদিক সামগান এবং গন্ধর্ব সংগীত নিঃসন্দেহে প্রাচীনতর। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সংগীতের উল্লেখ বেদ্‌, পুরাণ, বৈদিক সাহিত্যাদি এবং পুরাণাদিতে নানাভাবে উল্লিখিত হলেও তাদের কোনো পদ্ধতিগত বা বৈজ্ঞানিক আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়নি। প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের স্বরূপগত ব্যাখ্যা ভরতপূর্ব সংগীত-শাস্ত্রাদির গ্রন্থাদিতে অবশ্যই লিপিবদ্ধ যে ছিলো সে প্রমাণের অভাব নেই। দুঃখের বিষয় ঐ সব গ্রন্থগুলি বহু পূর্বেই লুপ্ত কিংবা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। নাট্যশাস্ত্রই একমাত্র প্রাচীনতম গ্রন্থ যা প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের গৌরব কে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি ভরতমুনি দ্বারা রচিত বলে সুবিদিত। কিন্তু পুরাণাদি এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে একাধিক ভরতের অস্তিত্ব খ্রী: পূর্বাব্দ যুগে ছিলো। তাদের মধ্যে আদি ভরত, ব্রহ্মা ভরত, সদাশিব ভরত, দ্রুহিন ভরত ইত্যাদি অনেক ভরতের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন বর্তমানে প্রাপ্ত নাট্যশাস্ত্রে গ্রন্থটি একাধিক সংগীত-শাস্ত্রীদের দ্বারা রচিত হলেও বেশীর ভাগ অংশ রচনা করেছিলেন দ্রুহিন ভরত। ভরত আসলে নাট্য সম্প্রদায়ের গুণী। খ্রীঃ পূর্বাব্দ যুগে গান্ধর্ব নাটকের সঙ্গে যারাই গভীর ভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁদের অনেকেই "ভরত" উপাধি গ্রহন করতেন। অতঃপর আমাদের আলোচ্য নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি মূলত: নাট্যের শাস্ত্র নিয়ন্ত্রক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সংগীতের বিজ্ঞান নিয়ে কিংবা তত্ত্ব

নিয়ে আলোচনা কোনো ভাবেই অপরিহার্য নয়। তাই নাট্যশাস্ত্রে আমরা প্রাচীন গান্ধর্ব সংগীতের যে আলোচনা পাই তা একান্তভাবেই প্রাচীন গান্ধার্বীয় সংস্কৃত নাটকে প্রযোজ্য নাট্যসংগীত রূপেই পাই।

নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি (আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ২০০) প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাভরত রচিত সুপ্রাচীন নাট্যকে (আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ১২০০) এর সংক্ষিপ্ত সংকলন। কাজেই নাট্যশাস্ত্রে প্রাগ-বৌদ্ধ যুগের সংগীত ও নাট্যের যে সব আলোচনা রয়েছে সেগুলি নিঃসন্দেহে নাট্যবেদ থেকে সংকলিত। যাইহোক বর্তমানে প্রাপ্ত নাট্যশাস্ত্রে মোট অধ্যায়ের সংখ্যা ৩৬টি। এর মধ্যে ২৮তম -৩৩তম অধ্যায় পর্যন্ত ভরতমুনি প্রাচীন গান্ধর্ব সংগীতের বিস্তৃত আলোচনা উস্থোপনা করেছেন।

২৮ তম অধ্যায়ে ভরত সপ্তস্বর, তিন স্থান, স্বরের শুদ্ধ- বিকৃত রূপ, শ্রুতি, দুই-গ্রাম, মূর্ছনা, তান, স্বরের চতুর্বিধ প্রকৃতি (বাদী, সমবাদী, বিবাদী, অনুবাদী), দুই গ্রামে শুদ্ধ-বিকৃত জাতি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছেন।

২৯ তম অধ্যায়ে ভরত ষড়জ ও মধ্যম গ্রামাশ্রিত শুদ্ধি-বিকৃত নিয়ে ২৮টি জাতির   স্বরাশ্রিত অষ্টরসের কথা বলেছেন। বলেছেন বর্ণ এবং অলংকার এবং তাদের ভেদের কথা। এই অধ্যায়েই ভরত মুনি তন্ত্রীবাদ্যের অঙ্গুলীচালনা জনিত এক ও দুই হস্তের বাদন সম্পর্কে নানা প্রকার ধাতুর ব্যাখ্যা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রের এই অংশের আলোচনা থেকেই বোঝা যায় যে, খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতেও আধুনিক কালের মতন তুম্বাযুক্ত তন্ত্রী বাদ্যও দুই হাত দিয়েই বাজানো হত । অতঃপর যারা সিদ্ধান্ত করেছেন ভরতকালীন যুগে দন্ড ও তুম্বা বিশিষ্ট তন্ত্রীবাদ্যের অস্তিত্ব ছিলোনা, তাঁরা নাট্যশাস্ত্রের ধাতু সম্পর্কীয় আলোচনা পড়লে তাঁদের ঐ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সন্দিহান হতেন। এই অধ্যায়েই ভারত মাত্র দু-রকম বীনার কথা বলেছেন যথা- ৭ তন্ত্রী বিশিষ্ট চিত্রবীনা ও ৯ তন্ত্রী বিশিষ্ট বিপঞ্চী বীনা।

৩০ তম অধ্যায়ে ভরত সুষির বাদ্যের আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বংশী থেকে নির্গত সপ্তা স্বরের শ্রুতি-ভেদের কথা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

৩১ তম অধ্যায়ে ভরত গান্ধর্ব তাল এবং তাল প্রধান ও জাতি ভিত্তিক প্রকরণ গীতের কথা বিস্তারিত ভাবে বলেছেন। প্রাচীন এবং অর্বাচীন মিলিয়ে ৭+৭ = ১৪ টি প্রকরণ গীত তৎকালে প্রচলিত ছিলো। তাদের মধ্যে প্রায় ১০টির মতো গীত নাটকে ও আংশিকভাবে ধ্রুবাগীত রূপে ব্যবহৃত হতো।

৩২ তম অধ্যায়ে ভরতমুনি সু-প্রাচীন গান্ধর্বীয় নাট্যগীত বা ধ্রুবার আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে সংগীত শাস্ত্রীরা ধ্রুবার এই আলোচনা হুবহু অনুকরণ করেছেন। ধ্রুবার আলোচনার শেষে ভরতমুনি গীতি কবিতার পদ, তার বৈশিষ্ট্য এবং প্রাচীন লৌকিক বহুপ্রকার সংস্কৃত ছন্দের আলোচনা করেছেন।এছাড়াও

রয়েছে গায়ক-গায়িকা, বীনা ও বংশি বাদকদের গুণ ও দোষ, আচার্যের গুণ, শিষ্যের গুণ, গায়কের গুণ-দোষ ইত্যাদি।

৩৩ তম অধ্যায়ে ভরত নানা প্রকার আনদ্ধ বাদ্যের কাঠামো, বাদন-প্রণালী, বাদকের দোষ-গুণ প্রভৃতি আলোচনা করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা গুলি ছাড়াও নাট্যশাস্ত্রেই সর্বপ্রথম প্রাচীন ভারতীয় স্বর-গ্রামের 'অন্তর্ভূক্ত ২২টি শ্রুতির মান নির্ণয়ের এক ইঙ্গিতপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। মোট কথা, সব মিলিয়ে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের প্রাচীনতম প্রামাণিক শাস্ত্র গ্রন্থ হচ্ছে ''নাট্যশাস্ত্র''।

2. বৃহদ্দেশীতে সংগীত সম্পর্কিত আলোচনা:

বৃহদ্দেশী গ্রন্থটি মতঙ্গমুনি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ৫ম থেকে ৬ষ্ঠ শতকে রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং নারদ ও মতঙ্গের মধ্যে কথোপকথনের আকারে লিখিত। এখানে নারদ প্রশ্নকর্তা এবং মতঙ্গ তার ব্যাখ্যাকার। বর্তমানে প্রাপ্ত বৃহদ্দেশী গ্রন্থটি খন্ডিত, কারণ এই গ্রন্থের শেষে বলা হয়েছে ''ইদানী কথয়িষ্যামি বাদ্যস্য নির্ণয়ো যথা'' অর্থাৎ এখন আমি বাদ্য নির্ণয়ের কথা বলব। কিন্তু বৃহদ্দেশীতে বাদ্যের আলোচনা নেই। সুতরাং বর্তমানে প্রাপ্ত বৃহদ্দেশী গ্রন্থটি যে খন্ডিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ পর্যন্ত বৃহদ্দেশীর দুটি মাত্র সংস্করণ হয়েছে। একটি দেবনগরী অক্ষরে আরেকটি ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটিতে দেশি রাগের আলোচনা নেই এবং দ্বিতীয়টিতে দেশি রাগের আলোচনা ও বহু লুপ্ত শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রাপ্ত বৃহদ্দেশী গ্রন্থে মোট ৯টি প্রকরণ আছে। যথা-

১. দেশি উৎপত্তি প্রকরণ,

২. শ্রুতি প্রকরণ,

৩. স্বর প্রকরণ,

৪. গীতি প্রকরণ,

৫. জাতি প্রকরণ,

৬. রাগ লক্ষণ,

৭. ভাষা লক্ষণ,

৮. দেশী রাগ-লক্ষণ এবং

৯. প্রবন্ধ প্রকরণ।

১) দেশি উৎপত্তি প্রকরণে মতঙ্গ দেশি এবং মার্গগীতের নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন, যা আর কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। তার মতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব গান নারী ও বালক থেকে রাজা পর্যন্ত নিজ ইচ্ছায় গেয়ে এবং যে গানগুলি আঞ্চলিক ভাবে জনপ্রিয় সেগুলিকে তিনি দেশী বলেছেন, আর যে সমস্ত গান আলাপাদি দ্বারা যুক্ত, তাকে তিনি মার্গ গীত বলেছেন। এছাড়া তিনি সঙ্গীতিক স্বরের ও দেশী ও মার্গ ভেদ দুটি প্রকারের কথা বলেছেন।

২) শ্রুতি প্রকরণে তিনি শ্রুতির বিভিন্ন প্রকার ভেদের কথা আলোচনা করেছেন। তিনি শ্রুতির এক, দুই, তিন, বাইশ, ছেষট্টি এবং অনন্ত শ্রুতির কথা ব্যাখ্যা করেছেন। এই আলোচনা থেকেই আমরা জানতে পারলাম ভারতীয় ব্যবহারিক সংগীতে যে শ্রুতির কথা বলা হয় তার সংখ্যা সর্বদাই ২২। তিন সপ্তকে তার সংখ্যা হয় ৬৬। বাকি অন্যান্য প্রকার শ্রুতিগুলির সঙ্গে ব্যবহারিক সংগীতের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই।

৩) নাট্যশাস্ত্রে স্বরের জাতি,বর্ণ, কুল ইত্যাদির চর্চা নেই। কিন্তু মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে এগুলির আলোচনা করেছেন এবং তৎসহ ভরতের মত অনুসারে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের রুপ ও প্রদর্শন করেছেন। ভরত চতুর্বিধ স্বর অর্থাৎ বাদী-সমবাদী-বিবাদী-অনুবাদী স্বরগুলির পরিচয় শ্রুতির সাহায্যে দিয়েছেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন স্বরের ওই চতুর্বিধ প্রকৃতি কেবলমাত্র স্বরগ্রাম বা গ্রামের সঙ্গেই সম্পর্কিত। যেহেতু ভরত রাগের আলোচনা করেননি, তাই রাগের ক্ষেত্রে বাদী-সমবাদী-বিবাদী-অনুবাদী ভরতের বিচার গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়। রাগের ক্ষেত্রে ওই চতুর্বিধ স্বরের ব্যাপারে মতঙ্গ মুনি ই সর্বপ্রথম আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, রাগের ক্ষেত্রে কোন একটি স্বরকে এক বা একাধিক অনুবাদী স্বর প্রাধান্য দান করলে তবেই সেটি বাদী নামে পরিচিত হবে। তাই তিনি বলেছেন বাদী স্বর রাজার মত, সমবাদী স্বর মন্ত্রীর মত, অনুবাদী স্বর ভৃত্যের মত এবং বিবাদী স্বর শত্রুর মত আচরণ করে।

বৃহদ্দেশীতে ষড়জ গ্রাম ও মধ্যমগ্রাম এই দুটি স্বরগ্রাম বিবৃত হয়েছে। গান্ধার গ্রামের চর্চা নেই। মধ্যমগ্রামের আলোচনায় মতঙ্গ মুনি বলেছেন 'মা' এর সঙ্গে ধা এর সাত শ্রুতির অন্তরে 'ষড়জান্তরু সংবাদিত্ব' রয়েছে। ভরত মুনি এবং অনুগামী সংগীত শাস্ত্রীরা প্রায় সকলেই নয় শ্রুতি এবং ১৩ শ্রুতির অন্তরে সংবাদিত্বের কথা বলেন নি। মতঙ্গ মুনির এই বলার মাধ্যমেই বোঝা গেল ওই সময় ভারতীয় বীনা যন্ত্রাদিতে মোটা খরজের তার থেকে উৎপন্ন স্বয়ম্ভ নাদ্ রূপী অন্তরগান্ধারের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। আজও আমরা তানপুরা থেকে এই নাদ্ টি শুনতে পাই।

তিনি তান এবং মূর্ছনা প্রসঙ্গে যা কিছু বলেছেন সবই নাট্যশাস্ত্রের অনুরূপ। কিন্তু মূর্ছনার একটি অভিনব পদ্ধতির কথাও আমাদের জানাতে ভুলেন নি। সেটি হলো "দ্বাদশ স্বরমূর্ছনা"। এই পদ্ধতিতে প্রাচীন মূর্ছনার নামগুলি ঠিকই আছে, তাদের প্রারম্ভিক স্বর গুলো পৃথক হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ সা, নি, ধা, পা, মা, গা, রি-ষড়জগ্রামীও এই সাতটি মূর্ছনার প্রারম্ভিক স্বর যথাক্রমে ধা, নি, সা, রে, গা, মা, পা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪) গীত প্রকরণে মতঙ্গ মুনি দু'রকম গীতির কথা আলোচনা করেছেন।১) জাতি গানের গীতি অর্থাৎ মাগধী, অর্ধ মাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা যা তিনি নাট্যশাস্ত্র থেকে হুবহু উদ্ধৃত করেছেন এবং ২) রাগগীতি। এই রাগগীতি ছিল পাঁচ প্রকার-শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা এবং সাধারনী। গীতি মানে গাইবার ভঙ্গি। মতঙ্গ গ্রাম রাগগুলিকে বিভিন্ন গীতি অনুসারে বর্গীকরণ করেছেন, ফলে আমরা রাগগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা অনুমান করার সুযোগ পেলাম। এছাড়াও তিনি ভাষা, বিভাষা এবং অন্তরভাষা রাগগুলি এবং তাদের জনক রাগগুলি সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বস্তুতপক্ষে; মতঙ্গ মুনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গান্ধর্বীয় এবং দেশি রাগ গুলির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৫) জাতি প্রকরণে সাতটি শুদ্ধ এবং ১১ টি বিকৃত জাতির কথা তিনি যা আলোচনা করেছেন তা সবই নাট্যশাস্ত্রের হুবহু অনুকরণ মাত্র, কেবল পার্থক্য এই যে তিনি জাতিগুলির মূর্ছনার ব্যাপারে ভরতের সপ্তস্বরমূর্ছনা কে গ্রহণ না করে দ্বাদশ স্বর মূর্ছনা গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেকটি জাতির একটি করে ধ্রুবা গান বা নাট্য গীতির স্বরলিপি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৬) 'রাগ লক্ষণে' মতঙ্গ মুনি বিভিন্ন গীতির দ্বারা বর্গীকৃত গ্রামরাগ গুলির বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি এগুলির গায়ন সময়, ব্যবহার্য তাল, রস এবং বর্ণ ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন।

৭. 'ভাষালক্ষণে' মতঙ্গমুনি যাস্টিক মতে ১৫ টি ভাষা জনক এবং ৭৩ টি ভাষা ও তাদের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। তিনি সারদুল মতের ও চারটি ভাষা জনক এবং তাদের অধীনে ভাষাগুলি বিবৃত করেছেন।

৮. 'দেশীরাগ-লক্ষণের' আলোচনায় মতঙ্গমুনি বলেছেন দেশীরাগ অনন্ত। তিনি দেশীরাগ গুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন যথা – রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ এবং ক্রীয়াঙ্গ। তিনি বলেছেন যে দেশীরাগ গুলি গ্রামরাগের ছায়াশ্রিত সেগুলি রাগাঙ্গ, যেগুলি ভাষা রাগের ছায়াশ্রিত সেগুলি ভাষাঙ্গ এবং যেগুলি উৎসব, শোক ইত্যাদি ক্রিয়া-কলাপে ব্যবহার্য সেগুলিকে ক্রীয়াঙ্গ রাগ বলে।

৯. মতঙ্গমুনি প্রবন্ধ প্রকরণে মোট ৪৮ টি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। তাদের মধ্যে কোথাও চর্যা প্রবন্ধের কথা বলা নেই। সুতরাং অষ্টম শতাব্দীতে রচিত এবং সৃষ্ট চর্যা প্রবন্ধের অনেক আগেই মতঙ্গমুনির কাল ছিল এ কথা প্রমাণিত হয়।

3. সঙ্গীত-রত্নাকর (সাঙ্গদেব) :

এই গ্রন্থের রচনাকাল ধরা হয় ত্রয়দশ শতকের শেষার্ধে (১২৪৮-১২৬৫ খ্রি:) বলে অনুমান করা হয়। কোন কোন মতে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৪৭ খ্রিস্টাব্দেও ধরা হয়।

স্বরগতাধ্যায়, রাগবিবেকাধ্যায়, প্রকীর্ণাধ্যায়, প্রবন্ধআধ্যায়, বাদ্যাধ্যায়, তালাধ্যায় এবং নর্তকআধ্যয় মিলিয়ে মোট সাতটি অধ্যায়ে এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। এই অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু তিনি যে সকল প্রাক্তন গুণীদের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থাদির থেকে আহরণ করেছিলেন, তারা হলেন- সদাশিব, শিব, ব্রহ্মা, ভরত, মতঙ্গ, যাষ্টিক, কশ্যপ, শার্দূল, কোহল, বিশিখিল, দত্তিল, কম্বল, অশ্বত্তর, বায়ু, বিশ্বাবসু, রম্ভা, অর্জুন, নারদ, তম্বরু, আন্জনেয়, রাবণ, নন্দীকেশ্বর, স্বাতি, বিন্দুরাজ, ক্ষেত্ররাজ, রাহুল, নান্যদেব, ভোজ, পবমন্দী, সোমেশ্বর, জগদেক , লোল্লট, উদ্ভট, শম্ভু, অভিনব গুপ্ত, কীর্তিধর প্রভৃতি।

ক) **স্বরগতাধ্যায়**:

এই অধ্যায়ে যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে সেগুলি, ১. পদার্থ সংগ্রহ প্রকরণ (মঙ্গলাচরণ, বংশ - পরিচয়, গ্রন্থ-পরিচয়, সংগীত-লক্ষণ, গীত ও অধ্যায় পরিচয়) ২. পিণ্ডৎপত্তি প্রকরণ (নাদ্, ব্রহ্মা, স্বরূপ, জীব স্বরূপ, সৃষ্টি ক্রম, মনুষ্য-ভেদ, ভাব-ভেদ, ইন্দ্রিয়-ভেদ, গুণ-ভেদ, প্রাণ-ভেদ, দেহ-ভেদ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চক্র ও নাড়ী সমূহ) ৩. নাদ্ ,স্থান, শ্রুতি, স্বর, জাতি, কুল-দেবতা, ঋষি, ছন্দ ও রস প্রকরণ। সাঙ্গদেবের সর্বমোট সরসংখ্যা ১৯ (শুদ্ধ ৭টি এবং বিকৃত ১২ টি)। ৪. গ্রাম মূর্ছনাক্রম ও তান-প্রকরণ, মূর্ছনা, মূর্ছনা নাম, বোধিনী, তান-প্রস্তার সিদ্ধান্ত, খন্ডমেরু, খন্ডমেরুর আকৃতি, খন্ডমেরুর প্রয়োগ দ্বারা তান-জ্ঞান, তানের প্রকার, ষড়জগ্রাম তানবোধিনী, মধ্যমগ্রাম তানবোধিনী,৫. সাধারণ প্রকরণ, ৬. বর্ণালংকার প্রকরণ, ৭. জাতি, ৮. গীতি-প্রকরণ তাছাড়া স্বর-প্রস্তার।

খ) **রাগবিবেকাধ্যায়:**

এই অধ্যায়ে ১. গ্রামরাগ ও তার বিভাগ, উপ-রাগ ও তার বিভাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তর্ভাষা, জনক রাগ ও তার লক্ষণসমূহ, ২. রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, দেশীরাগ, প্রসিদ্ধ গ্রামরাগের নাম উল্লেখ করেছেন।

গ) **প্রকীর্ণাধ্যায়:**

বাগগেয়কারের লক্ষণ, গীতের দোষ-গুণ, গায়কের দোষ-গুণ, শব্দের দোষ-গুণ, শরীর লক্ষণ, গমক, বিভিন্ন স্থায়ী, আলাপ, আলপ্তি, লক্ষণ ও বিভাগ, কুতপ প্রভৃতি।

এই অধ্যায় থেকে বোঝা যাবে, আধুনিক প্রকারের সঙ্গে ওই সময়ের যে মিল-গরমিল দেখা যায়, তা কিভাবে সংগটিত হয়েছিল।

ঘ) **প্রবন্ধাআধ্যায়:**

এই অধ্যায়ে আছে গান্ধর্ব ও গানের লক্ষণ, নিবদ্ধ-অনিবদ্ধ গান, ধাতু-প্রবন্ধ, গীতের দোষ-গুন ইত্যাদি। এই অধ্যায়ের গান্ধর্ব গীতরীতি নিয়ে যে রূপ আলোচনা করা হয়েছে, তাতে মনে হয় আচার্য সাঙ্গদেব এই গীতিরিতি সম্বন্ধে খুব ভালোভাবেই জ্ঞাত ছিলেন।

ঙ) **বাদ্যাধ্যায়:**

এই অধ্যায় আছে মার্গ-তাল, গীত-প্রকরণ, দেশি-তাল প্রকরণ ইত্যাদি।

চ) **তালাধ্যায়:**

এই অধ্যায়ে আছে বাদ্যের প্রকারভেদ (তত্, সুষির, আনদ্ধ ও ঘন), বাদ্য ও বাদকের দোষ-গুণ ইত্যাদি, বাদন প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

এই অধ্যায়ের একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে যদিও সাঙ্গদেব তার সময়সাময়িক কালে প্রচলিত স্বরসপ্তক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেননি। তবু যদি কেউ প্রাচীনকালে স্বরসপ্তক নিয়ে গবেষণা করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে এই অধ্যায়ে বর্ণিত বংশী সম্বন্ধীয় আলোচনাটি তার কাজে লাগতে পারে। তাছাড়া প্রকীর্ণ, প্রবন্ধ তাল অধ্যায় থেকে জানা যায় যে ধ্রুপদ-ধামারের ইতিহাস বলে আমরা যা বর্তমানে শুনে থাকি তা কতখানি কাল্পনিক, ইসলামিক প্রভাবে ভারতীয় সংগীতে অ-ভারতীয় পরিবর্তন ঘটেছে বলে যেসব আলোচনা হয়েছে তাও কতখানি ভ্রমাত্মক।

ছ) **নর্তকাআধ্যয়:**

এই অধ্যায় আছে নাট্যৎপত্তি, নৃত্যনাট্য ও নৃত্যের আলোচনা।

সংগীত রত্নাকরের দুর্বোধ্য অংশকে আমাদের কাছে সুবোদ্ধ করে তোলার জন্য টিকাকার সিংহভূপাল (১৪০০ খ্রি: শেষ ভাগ) এবং কল্লিনাথের(১৫০০ খৃঃ মধ্যভাগে) কাছে আমরা চির ঋণী।

এই গ্রন্থের স্বরগতাধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ শ্রুতি-বীনা-স্বরগ্রামবোধিনী শীর্ষক একটি সারণা চতুষ্টয়ী প্রকার বর্ণিত হয়েছে। ভরতের সারণা চতুষ্টয়ীর সঙ্গে এই সারণার তফাৎ এই যে, ভরত প্রত্যেক বীনায় সাতটি তারের সাহায্যে এবং সাঙ্গদেব ২২ টি তারের সাহায্যে এই প্রক্রিয়া দেখিয়েছেন।

সবদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে ‘সংগীত-রত্নাকর’ গ্রন্থটি ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ।

4. নারদীয়শিক্ষায় সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা:

‘নারদীয় শিক্ষা’ রচনা অথবা সংকলন করেন মুনি নারদ। অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে নারদীয় শিক্ষার আলোচ্য বিষয়বস্তু বহুবিধ ও ভাবসম্পদে বহুমূল্যবান। বৈদিক ও বৈদিকোত্তর এই দুই যুগের সংগীতের মধ্যে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন ও সেই সেই যুগের সকল কিছু উপাদানে পরিচয় দিয়েছেন। মোটকথা নারদীশিক্ষা না থাকলে আমাদের পক্ষে বৈদিক সামগানের স্বরূপ ও রীতিনীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক মার্গ ও দেশী সংগীতের সঙ্গে বৈদিকের সম্পর্ক ও তার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জানা অসম্ভব হতো। এই কারণেই শিক্ষাকার নারদকে আমরা সংস্থার ও নবজাগরণ-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত রূপে গণ্য করতে পারি।

নারদিয় শিক্ষা গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১ ম থেকে ২ য় শতকের মধ্যবর্তী সময়। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী বলেছেন ‘নারদীয় শিক্ষা’ গ্রন্থটি নাট্যশাস্ত্রের অন্তত এক শতাব্দী আগে রচিত। সঙ্গীত ও সংস্কৃতি,২৪১ ।এই গ্রন্থটি ২ টি বিভাগে বিভক্ত এবং প্রতিটি বিভাগে ৮টি করে অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলিকে তিনি কান্ডিকা বলে উল্লেখ করেছেন।

নারদীয়শিক্ষায় প্রথম বিভাগের প্রথম কান্ডটিকায় স্বরের উৎপত্তিস্থান সম্পর্কে মুনি নারদ বলেছেন- উচ্চ-নিচ ও মধ্য তথা উদাত্ত,অনুদত্ত ও স্বরিত স্বর তিনটি বেদে (সামগান) ব্যবহৃত হতো। এছাড়াও সামগানে সাতস্বর- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য ও ক্রুষ্ট এছাড়াও লৌকিক সাত স্বর যথা- ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদের পরিচয় দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে স্বরসংখ্যার তারতম ও প্রয়োগে গানগুলির বিচিত্র নাম হোত যেমন আর্চিক(একটিমাত্র স্বর), গাথিক(দুটি স্বর), সামিক(তিনটি স্বর), স্বরান্তর(চার), ঔড়ব(পাঁচ), ষাড়ব(ছয়) ও সম্পূর্ণ(সাত)। এখানে উল্লেখ করতে হবে যে ওই সাতটি শ্রেণীর গান একই সময়ে সমাজে সৃষ্টি হয়নি। ক্রমবিকাশের ধারাকে অবলম্বন করে সাতটি শ্রেণীর পূর্ণবিকাশ হতে কয়েক শত বছর লেগেছিল। এক কথায় আমরা বলতে পারি ৭ যুগের অবদানে সাত স্বর ও সাত শ্রেণীর গান আমরা পেয়েছি। বর্তমানে প্রথম চারটি স্তর লুপ্ত হয়েছে, এখন শুধুমাত্র ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ শ্রেণী বিদ্যমান। নারদ মুনি স্বরস্থানের পরিচয় দিয়ে বলেছেন উড়ু, কণ্ঠ ও শির এই তিন স্থানে স্বর প্রকাশ পায়। প্রকৃতপক্ষে প্রথম কান্ডিকায় শিক্ষাকার নারদ সামগানের পরিচয় দিয়ে দ্বিতীয় কান্ডিকা থেকে লৌকিক সংগীতের বিচিত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। তবে বৈদিক গানেরও লক্ষণ এবং স্বরূপ তিনি লৌকিকের পাশাপাশি স্পষ্টভাবে দিতে চেষ্টা করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় কান্ডটিকায় প্রথমে বৈদিক ও লৌকিক দু'রকম গানের বর্ণনা তিনি করেছেন। এই অধ্যায়ের ১১ নম্বর শ্লোক গুলিতে গায়কের দশটি গুণের সার্থকতা তিনি দেখিয়েছেন। যথা-

১.রক্ত(কন্ স্বরের সঙ্গে বীনা ও বাঁশির প্রয়োগে রঞ্জিত গান),

২.পূর্ণ (শ্রুতি স্বর ছন্দ ও পদ দ্বারা সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্ভুল গান),

৩. অলংকৃত (কন্ঠ থেকে যথাযথ নিম্ন ও উচ্চ স্বরে উচ্চারণ),

৪.প্রসন্ন (কন্ঠকে জড়তাহীন ভাবে সংগীতে ব্যবহার),

৫.ব্যক্ত (ধ্বনির অভিব্যক্তি বা পদের সুস্পষ্ট অর্থযুক্ত হওয়া),

৬.বিক্রুষ্ট বা বিকৃষ্ট (উচ্চস্বরে রঞ্জকতা গুনসম্পন্ন উচ্চারণ),

৭. শ্লক্ষ্ণ: (দ্রুত, বিলম্বিত, উচ্চ, নিচ, প্লুত, সমাহারে সঙ্গীত সম্পাদন),

৮.সম (স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহ ও অবরোহ প্রভৃতি বর্ণগুলিকে লয়ের সঙ্গে একীভূত করা,

৯.সুকুমার (কন্ঠ চেপে স্বর নির্গত না করা) ও

১০. মধুর (কন্ঠের স্বভাবসুন্দর মাধুর্য ও কমনীয়তা বজায় রেখে গান)।

(স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী "সংগীত ও সংস্কৃতি" বইয়ের ২৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে **'রক্ত'** স্থানে **'ব্যক্ত'** শব্দটির ব্যবহার নিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন)।

দ্বিতীয় কান্ডিকায় প্রথম শ্লোকে তান, রাগ, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা, প্রভৃতির লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। স্বর, গ্রাম ও মূর্ছনার পরিচয় দিতে গিয়ে মুনি নারদ উল্লেখ করেছেন যে স্বর সাতটি, গ্রাম তিনটি, মূর্ছনা একুশটি ও একোনপঞ্চাশৎ (৪৯) তান আর এদের সমবেত রূপের নাম "স্বরমণ্ডল"। এখানে তিনি লৌকিক সাত স্বরের কথাই বলেছেন। শিক্ষাকার নারদের সময় গান্ধার গ্রামের প্রচলন না থাকলেও গান্ধার গ্রামের রূপ ও পরিচিত তিনি দিয়েছেন ।এছাড়াও উল্লেখযোগ্য মধ্যমগ্রামের প্রচলন ছিল। কারণ তিনি এই দুটি গ্রামের অর্থাৎ ষড়জগ্রাম এবং মধ্যমগ্রামের স্বরসন্নিবেশের পরিচয় দিয়েছেন। তিন গ্রামের মূর্ছনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নারদ মুনি মূর্ছনা গুলিকেও কুল ও শ্রেণী হিসেবে ভাগ করেছেন।

তৃতীয় কাণ্ডিকায় ৫ থেকে ১১ শ্লোকগুলিতে বলা হয়েছে বিভিন্ন রাগ-রাগিনী সম্পর্কে, ৮ম শ্লোকে ষড়জগ্রাম, ৯ম শ্লোকে কৈশিক ও সাধারিত, ১০ শ্লোকে কৈশিক মধ্যম, ১১শ শ্লোকে মধ্যমগ্রাম, গান্ধর্ব সংগীত (গান ও বেনু সংমিশ্রণে যে সংগীত) ও ৫ম শ্লোকের মধ্যমরাগ ও ষাড়বের উল্লেখ আছে। তিনি সর্বমোট ৭টি গ্রাম রাগের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আসলেই এগুলি রাগ কিনা তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে

পাওয়া যায়নি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে শিক্ষাকার নারদের সময়েও ভারতীয় সমাজে রাগের সৃষ্টি ও রাগ-রূপের অনুশীলন ছিল।

চতুর্থ কাণ্ডীকার প্রথম শ্লোকে গানকে ‘দেশী’ পর্যায়ে ফেলেছেন এবং বেনু সেখানে দেশি সংগীতের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী শ্লোক দুটি সংগীত জগতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কারণ এই শ্লোকেই মুনি নারদ বৈদিক ও লৌকিক সংগীত দুটির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন যা সংগীতের ইতিহাসে একটি মূল্যবান উপাদান। তিনি উভয়কেই গণ্য করেছিলেন সামগোত্রীয় হিসেবে।

সংখ্যা	সামগানের স্বর	শিক্ষাকার নারদ নিরপিত স্বর
৭	ক্রুষ্ট	পঞ্চম
১	প্রথম	মধ্যম
২	দ্বিতীয়	গান্ধার
৩	তৃতীয়	ঋষভ
৪	চতুর্থ	ষড়জ
৫	মন্দ্র	ধৈবত
৬	অতিস্বার্য	নিষাদ

এরপর শিক্ষাকার নারদ সামস্বর ও লৌকিকস্বর এই দুটির মধ্যে ধ্বনীগত ঐক্য দেখিয়ে সাতস্বরের বিকাশের কথা জানিয়েছেন।

৫ম শ্লোকেও শিক্ষাকার নারদ গ্রাম-রাগদের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও ১০ম ও ১১শ শ্লোকে কৈশিক অথবা কৈশিক মধ্যম গ্রাম-রাগের নাম উল্লেখ করেছেন। ৭ম থেকে ১২ শ্লোকগুলিতে সাত স্বরের জন্ম রহস্য তথা সাতটি লৌকিক দেবতা এবং ঋষিদের নাম উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চম কান্ডিকা আরম্ভ হয়েছে দরবি ও গাত্রবীনার প্রসঙ্গ নিয়ে। তিনি এই দুটি বীনার নাম উল্লেখ করেছেন শুধুমাত্র এর মধ্যে গাত্রবীনা সামগানে ব্যবহৃত হতো বলে তিনি জানিয়েছেন। এরপর তিনি এই দুটি বীনার অনুশীলন বিধি যেমন হস্ত সঞ্চালন, সময়ের ব্যবধান প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম কান্ডিকায় মুনি নারদ সামস্বর হিসেবে প্রথমাদির আঙ্গিক ব্যবহার ও তাদের শ্রুতি প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। গানের মাত্রা বা ছন্দ রক্ষার জন্য মানব শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্বরগুলি কল্পনা করা হতো যাতে স্থানগুলির নির্দেশ দ্বারা স্বরের উচ্চারণের যথার্থ প্রমাণ করা যায়। এছাড়াও উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলী নির্দেশেরও নিয়ম আছে। এরপর শিক্ষাকার নারদ সুক্ষ-অন্তরস্বররূপ শ্রুতির প্রসঙ্গ তুলেছেন এবং তাও মাত্র

সামিক স্বরগুলির। শ্রুতি প্রসঙ্গে শিক্ষাকার নারদ মাত্র পাঁচটি যথা- ১.দীপ্তা,২. আয়তা,৩. করুণা,৪. মৃদু ও ৫. মধ্যা - শ্রুতির নাম উল্লেখ করেছেন।

এরপর শিক্ষাকার নারদ উদাত্তাদি স্বর, মাত্রা এবং ক্ষৈপ্র, তৈরবিরাম প্রভৃতি বৈদিক অন্যান্য স্বর সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। মাত্রা সম্পর্কে নারদ বলেছেন কারো মতে নিমেষ কাল ও অন্যমতে বিদ্যুৎ চমকের কালকে 'মাত্রা' বলে।। এরপরে নারদের শিক্ষায় সংগীত সম্পর্কে বিশেষ উপযোগী আলোচনা নেই। তাই আমরা এখানে সে সব অনুশীলন থেকে বিরত থাকলাম।

১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী "সংগীত ও সংস্কৃতি" ০২.১৯৫৩. পৃষ্ঠা- ২০৮-২৯১.

২.Bharatiya sangiter Itikotha, Dr. Dwapan Kumar Naskar,07.04.2014-P-56-60.

5.চতুর্দন্ডী প্রকাশিকা (পন্ডিত ভেঙ্কটমখী):

এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ। এই গ্রন্থটি রচনা করেন পন্ডিত ভেঙ্কটমখী বা ভেঙ্কটমখী দীক্ষিত। পন্ডিত ভেঙ্কটমখী কে দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের পানিনী ও বলা হয়। চতুরদন্ডী বলতে ভেঙ্কটমখী তৎকালীন দক্ষিণ ভারতের প্রচলিত চার প্রকার গীতিশৈলীকে বুঝিয়েছেন। এবং তাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাও করেছেন। সেগুলি হল: আলাপ গান, ঠায় গান বা স্থায় গান, প্রবন্ধ গান ও গীত।

এই গ্রন্থ ১০ টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। যথা- ১.বীনা প্রকরণম্, ২. শ্রুতি প্রকণরম্, ৩. স্বর প্রকরণম্, ৪. মেল প্রকরণম্, ৫. রাগ প্রকরণম্, ৬. আলাপ প্রকরণম্, ৭. স্থায় প্রকরণম্ ৮. গীত প্রকরণম্, ৯. প্রবন্ধাদি প্রকরণম্ এবং তাল প্রকরণম্ (লুপ্ত)।

১. বীনা প্রকরণম্ :

বীনা প্রকরণমে পন্ডিত ভেঙ্কটমখী , সোমনাথের রাগ-বিবোধ এবং রামামাত্যের 'স্বরমেল কলানিধি' অনুসরণ করেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি দুই ধরনের তত্ যন্ত্র এবং তাদের ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন। তিনি প্রধানত ৩ ধরনের বীণার কথা উল্লেখ করেছেন যথা শুদ্ধমেল বীনা, মধ্যমমেল বীনা এবং রঘুনাথেন্দ্র মেলবীনা। এই ৩ ধরনের বীণার প্রত্যেকটির উপর তারের বিন্যাস বর্ণনা করার সময় তিনি পন্ডিত অহবলের অনুসরণ করেছেন। সেই অনুযায়ী তিনি বলছেন তারের বিন্যাস, দুটি উপায়ে করা যেতে পারে যথা একটি নির্দিষ্ট তার যেটাতে সমস্ত রাগ বাজানো যেতে পারে (সর্ব-রাগ মেলবীণা); এবং অপরটি, একটি বিশেষ রাগ (এক-রাগ মেলবীনা) বাজানোর কথা বলা হয়েছে।

তিনি আরো জানাচ্ছেন যে রামামাত্যের বর্ণিত সাধারণ শুদ্ধ ও মধ্যম-মেলবীনা ছাড়াও উচ্চস্বর যুক্ত একটি বীনাও ছিল। যেখানে প্রথম তিনটি তারকে উপেক্ষা করে চতুর্থটি ষড়জে বাজত। গোবিন্দ দীক্ষিত রাজার সম্মানে এর নামকরণ করেছিলেন রঘুনাথেন্দ্র মেল বীনা।

২. শ্রুতি প্রকণরম্ :

এই অধ্যায়ে পন্ডিত ভেঙ্কটমখী শ্রুতিদের নিয়ে কাজ করেছেন । তিনি ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে ২২ টি শ্রুতির এবং ৭টি স্বরের উপর তাদের বিভাজন সম্পর্কে জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন যে ২২ টি শ্রুতির সমান ব্যবধানে স্থাপন করা হয় না, তবে রাগের স্বর কাঠামোর উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট বিভাজন স্থাপন করা হয়।

৩. স্বর প্রকরণম্ঃ-

তৃতীয় অধ্যায়ে পন্ডিত ভেঙ্কটমখী স্বরের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে মুখারী রাগের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেছেন যেখানে সা, মা এবং পা চারটি শ্রুতি, গা এবং নি দুটি শ্রুতি এবং রি এবং ধা এর তিনটি শ্রুতি রয়েছে। বিকৃতস্বর সম্পর্কে তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে রামামাত্য এবং সারঙ্গদেবের গ্রন্থে বিবরণ হিসেবে স্বরের সংখ্যা ৭ বা ১২ টি নয়, আসলেই সেটি ৫ টি। উনার মতে ৫টি বিকৃত স্বর হল: সাধারণ গান্ধার, অন্তর গান্ধার, বড়ালি মধ্যম, কৌশিকী নিষাদ এবং কাকোলি নিষাদ।

এরপরেই তিনি প্রাচীন গ্রামগুলিকে নিয়ে আলোচনা করেছেন (ষড়জ্, মধ্যম এবং গান্ধার)। এছাড়াও তিনি মূর্ছনা এবং তার নিয়ে অলংকার গমক এবং বাদী সমবাদী স্বর সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন যেগুলো প্রাচীন গ্রন্থের বর্ণনা থেকেই তিনি উল্লেখ করেছেন। বাদী-সমবাদীর ক্ষেত্রে তিনি সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও প্রাচীন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন এবং দৃষ্টান্তর স্থাপন করেন।

৪. মেল প্রকরণম্ঃ-

চতুর্থ অধ্যায় তিনি মেল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আমাদের অবগত করেন। তিনি শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর থেকে যথাসম্ভব সংখ্যক মেল গঠনের ফলস্বরূপ তিনি ৭২টি মেল সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্য তিনি মাত্র 19 টি মেলর রাগ শনাক্ত করতে পেরেছিলেন যাদের নাম তিনি দিয়েছিলেন কিন্তু বাদবাকি ৫৩টির নাম তিনি সে সময় বরাদ্দ করতে পারেন নি। এগুলোকে তিনি তাত্ত্বিক সম্ভাবনা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। বলেছেন যে যদি কোন রাগের আরোহন ও অবরোহনক্রমে সাতটি স্বর বর্তমান থাকে তবে তাকে মেলরাগ বলা যেতে পারে। সেই সময় তিনি মেলের উপর নির্ভর করেই রাগ নির্ণয় করেছেন। ৭২ মেল পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন “আমার কোন সন্দেহ নেই ৭২ মেল সম্পর্কে, যেহেতু এই ৭২ টি মেলের মধ্যে মাত্র কয়েকটিই

পরিচিত এবং অনুশীলনে পাওয়া যায়। তবে আমি এমন একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছি যা সর্বকালের এবং সমস্ত দেশের সমস্ত রাগগুলিকে চিহ্নিত করতে সমর্থ হবে। বর্তমানে পরিচিত রাগগুলি এবং ভবিষ্যতে তৈরি হতে পারে এমন রাগগুলি বোঝার জন্যই আমি ৭২টি মেলের পরিকল্পনা করেছি”। **(Dr. V. Raghavan, Indian Music, Vol: 2, P-264-5)**

পন্ডিত ভেঙ্কটমখীর মেল পদ্ধতিটি পরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংশোধন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে (তিনি যে ৫৩ টি মেলের নামকরণ করে যেতে পারেন নি) সেগুলির যথাযথভাবে স্বীকৃত নাম বরাদ্দ করা হয়েছিল। পাশাপাশি নামের প্রথম দুটি শব্দাংশের সাহায্যে রাগ সংখ্যা সনাক্ত করার জন্য ক-ট-প-য়া-দি

॥ কটপয়াদি চক্র ॥

সংখ্যা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০
ক-আদি নব	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট-আদি নব	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
প-আদি পঞ্চ	প	ফ	ব	ভ	ম	×	×	×	×	×
য-আদি অষ্ট	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ	×	×

পদ্ধতিও চালু করা হয়েছিল।

৫. রাগ প্রকরণম্ঃ-

এই অধ্যায়ে পন্ডিত ভেঙ্কটমখী ১০ লক্ষণ যুক্ত (গ্রহ, অংশ তার, মন্দ্র, ষাড়ব, ঔড়ব অল্পত্ত, বহুত্ব, অপন্যাস এবং ন্যাস) রাগ সনাক্তকরণের প্রাচীন পদ্ধতির কথা স্মরণ করেছেন। তিনি আবারও গ্রামরাগ ভাষারাগ ইত্যাদি রাগগুলির পূর্ববর্তী শ্রেণীবিভাগের কথা বলেছেন। তিনি গ্রহস্বর ভিত্তিতে বাছাই করা ৫৫ টি রাগের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি ৫৪ টি রাগের একটি শ্রেণীবদ্ধ তালিকা এবং বর্ণনা, স্বরকাঠামো এবং মেলের উল্লেখ করেছেন।

৬.আলাপ প্রকরণম্ঃ-

এই অধ্যায়ে পন্ডিত ভেঙ্কটমখী এক-একটি রাগের আলাপ পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন।

৭.স্থায় প্রকরণম্ঃ-

এই অধ্যায়ে পন্ডিত ভেঙ্কটমখী মাত্র সাতটি শ্লোকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন রাগের সৌন্দর্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অলংকারের ভূমিকা।

৮.গীত প্রকরণম্ঃ-

এই অধ্যায় তিনি গীত, প্রবন্ধের শুদ্ধসুর এবং সালগসুর শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন পরবর্তীকালে সালগসুর প্রবন্ধ থেকেই গীতের উৎপত্তি সম্পর্কে। তিনি সালোগসুরের অন্তর্গত প্রবন্ধের ৭ টি রূপ বর্ণনা করেছেন যথা-ধ্রুব, মত্ত, প্রতিমত্ত, নিশারুক, অট্টতাল, রস এবং একতালি।

৯. **প্রবন্ধাদি প্রকরণম্ঃ-**

প্রবন্ধ প্রকরণ হলো এর আগের অধ্যায়ের অর্থাৎ গীত প্রকরম্ এর সম্প্রসারণ। কিন্তু এটি অসম্পূর্ণ। এখানে পন্ডিত ভেঙ্কটমখী প্রবন্ধকে ৬টি অঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করেছেন যথা: স্বর, বিরুদু, পদ্, তেনা, পাটা এবং তালা এবং চারটি ধাতু-র (উদগ্রহ, মেলাপেকা, ধ্রুব এবং অবগাহ) কথা বলেছেন। এরপর তিনি প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগে অঙ্গ সংখ্যা এবং ধাতু সংখ্যার উপর নির্ভর করে গঠন করেন এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

১০. **তাল প্রকরণম্ঃ-**

তাল প্রকরণটি বর্তমানে লুপ্ত হয়েছে।